International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-III, Issue-I, February 2017, Page No. 1-16
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

‘ঘরে-বাইরে’র অবচেতন: স্বাধিকার ও সম্মোহন, বিম্বে—প্রতিবিম্বে

ড. অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নহাটা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, নহাটা, উত্তর চব্বিশ পরগণা, কলিকাতা, ভারত

Abstract

The Partition of Bengal was took place in the year 1905. Depending upon this background Rabindranath Tagore wrote his Sparkling political novel named ‘Ghore Baire’ which was published in the year 1916. The main role three characters of this novel are Nikhilesh, Bimala and Sandip has been formerly discussed in many ways. In this article, I want to draw my attention in these characters psychologically. In my point of view, Bimala is such an astonishing lady character by whom the most sensitive oscillation of unconscious was immensely reflected likewise the other two. On the one side, Nikhilesh’s contradictory ‘feeling of authority’ towards Bimala and on the other, Bimala’s conflict of mind rounding about Nikhilesh and Sandip has given a dramatic turn in its whole story. Obviously, Bimla is the centered character and Sandip runs through its periphery. The reticent character Nikhilesh has always tried to enact its symmetry in himself. According to the theory of Sigmund Freud, the mind unfolded into three parts and those are conscious, sub-conscious and unconscious. In my article, I have tried to judge that how they co-relates in a single character’s stroke with the other two in different situations. The psychological counter attack of indirect characters like Chandranath babu and Amulya are also very important in this sphere.

> *“সেদিন আমারও দৃষ্টি এবং চিত্ত, আশা এবং ইচ্ছা উন্মত্ত নবযুগের আবীরে লাল হয়ে উঠেছিল। এতদিন মন যে জগৎটাকে একান্ত বলে জেনেছিল এবং জীবনের ধর্মকর্ম আকাঙ্ক্ষা ও সাধনা যে সীমাটুকুর মধ্যে বেশ গুছিয়ে-সাজিয়ে সুন্দর করে তোলবার কাজে প্রতিদিন লেগে ছিল, সেদিনও তার বেড়া ভাঙে নি বটে, কিন্তু সেই বেড়ার উপরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ যে একটি দূর দিগন্তের ডাক শুনলুম স্পষ্ট তার মানে বুঝতে পারলুম না, কিন্তু মন উতলা হয়ে গেল।”*

প্রথম যেদিন এ উদ্ধৃতিটি পড়েছিলাম সেদিন থেকেই বাংলা সাহিত্যের বুকে এমন এক নারীর সন্ধান পেয়ে গিয়েছিলাম যার মনের গোটা দোলাচলটাই এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনে ভরা। একদিকে অন্তঃমূলে স্বামী নিখিলেশ ও তৎসম্পর্কিত সংসার তথা সংস্কারময় জীবনের প্রতি অনুভূত এক তীব্র অধিকার বোধ আর অন্যদিকে বহির্জীবনে সন্দীপের মোহমুগ্ধ সম্মোহনের, আকর্ষণের তীব্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই বিমলাকে এত উতলা করেছে। সেদিনই বুঝেছিলাম ‘ঘরে-বাইরে’র প্রধান মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার ভরকেন্দ্রবিন্দুটিই হলো বিমলা, সেই-ই সকল দ্বন্দ্ব ও ঘাত-প্রতিঘাতের প্রধান অবলম্বন, আর তাই বিমলাকে ছাড়া ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসের অবচেতনার জড়টিকে চিনে ওঠা দুঃসাধ্য।

১৯১৫ সালে 'সবুজপত্র' পত্রিকায় যখন থেকে 'ঘরে-বাইরে' ছাপা হয় তখন থেকেই উপন্যাসবোদ্ধারা একটি কথা বলে এসেছেন আর তা হলো, এ উপন্যাস 'ঐতিহ্য ও আধুনিকতা'র যুগলবন্দী। (**Combination of Tradition & Modernity**) এই ঐতিহ্য ও আধুনিকতাকে হয়তো সবচেয়ে বেশি করে খুঁজে পাওয়া যায় এ উপন্যাসের নিখিলেশ ও বিমলা চরিত্রেই। টানাপোড়েনটাও এ নিয়ে আর এ দুটি চরিত্রেই। রবীন্দ্রনাথ এ উপন্যাসে এ দুই-য়ের একটা সেতুবন্ধনও করতে চেয়েছেন, যদিও তা ছিল পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরেই। বলা ভালো,'ঘর' যদি ঐতিহ্যের প্রতীক হয় তবে 'আধুনিকতা' বা 'উত্তর-আধুনিকতা' অবশ্যই 'বাইরের', যাকে আমরা বারেবারেই আমদানিকৃত পাশ্চাত্যের পলি অথবা প্রভাব বলেই জেনে এসেছি। তাই হয়তো উপন্যাসের আলোচকদের কেউ কেউ এ উপন্যাসকে **'Intersection of Two sets of Preoccupation: Global and National'**-ও বলে থাকেন। কিন্তু মুশকিল বাঁধে তখনই যখন তা এমন ভারে ভারে ভরে যায় যখন শেষে মূল সামাজিক অথবা জাতীয় ঐতিহ্যটিই প্রায় বিপন্ন হতে বসে। আমরা কবিকে কখনই আধুনিকতা বিরোধী ভাবি নি, ভাবনাটা সেখানেই যেখানে চাতুরী, ভণ্ডামি আর সর্বগ্রাসী স্বার্থবুদ্ধি তথাকথিত আধুনিকতা অথবা আধুনিক ভাবনাটাকেই একেবারে বদলে দেয় অথবা গ্রাস করে। হতে পারে এই আধুনিক ভাবনাটি ব্যাক্তিকেন্দ্রিক অথবা সমাজকেন্দ্রিক। যখন তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক তখন তা সকল মানুষের মাথাব্যথার কারণ নাও হতে পারে কিন্তু, যখনই তা ভ্রান্ত পথে, ভ্রান্ত মতাদর্শে দিশেহারা হয়ে স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বসমাজের জড়-কৌলিন্যটিরই পরিবর্তন ঘটাতে প্রয়াসী হয়, কৌম সমাজের বুকে সমান্তরাল ব্যবধানের দিকচিহ্নটিকে স্পষ্ট করে তোলে তখন আর চুপ করে বসে থাকা যায় না। বলাইবাহুল্য, বঙ্গভঙ্গ ও বয়কটের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এক সত্য পলিটিক্যাল বোধে চালিত হতে চেয়েছিলেন। অবশ্যই তাঁর সে বোধ সমসাময়িক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের এক সার্থক অনুসৃতি ছিল। কিন্তু ভেবে দেখা দরকার, সন্দীপের মধ্যে দিয়ে তাঁর এ ভাবনার বিপরীতক্রমটিকেই এ উপন্যাসে তিনি বেশী করে আর বাস্তব করে তুলে ধরতে চেয়েছেন। গাঢ় তমসাকে দেখলে তবেই না আলোর আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হয়ে ওঠে! উপন্যাসের সন্দীপ চরিত্রের ধ্বংস যজ্ঞের ভস্মাবশেষ থেকে তাই নিখিলেশের উজ্জ্বল আলোকময় উপস্থিতিকে আমাদের চিনে নিতে একেবারেই বেগ পেতে হয় না।

ফয়েড্রীয় মনস্তত্ত্বে মনের তিনটি স্তরের কথা বলা হয়। এই স্তর গুলি হলো যথাক্রমে চেতন, অচেতন ও অবচেতন। সাধারণত আমাদের মনের বাহ্যিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলি চেতন স্তর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অবচেতন মনে থাকে অপূর্ণ অসামাজিক ইচ্ছা ও কামনা-বাসনারা। এই সকল কামনা-বাসনা গুলি সহজে চেতন মনে উঠে আসতে পারে না। কারণ তারা অবিরত 'সুপার ইগো' (Super Ego) দ্বারা শাসিত হয়। ফলতঃ এই সকল অপূর্ণ কামনা-বাসনারা স্বপ্ন ও কল্পনার মধ্যে দিয়ে নিজেদের অসাধু আত্মসুখ চরিতার্থ করার উপায় খুঁজে ফেরে ফলে তারা চেতন মনের কাছাকাছি অচেতন স্তরে ভিড় জমায়। কিন্তু স্বাভাবিক ক্ষেত্রে স্বপ্ন বা কল্পনা শেষে এরা পুনরায় 'সুপার ইগো' দ্বারা শাসিত হয় ও অবচেতনেই ফিরে যায়। কিন্তু এরা একেবারে বিলীন হয়ে যায় না, বরং সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। উপযুক্ত পরিবেশ ও সুযোগ পেলেই এই সকল অপূর্ণ, অবাঞ্ছিত ও অসামাজিক ইচ্ছাগুলি অচেতনের বাধা কাটিয়ে সরাসরি চেতন মনে আছড়ে পড়ে আর তখনই মানুষ অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে কিংবা কোনো অপরাধ ঘটায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবচেতন মন থেকে উঠে আসা এই সকল অপরাধপ্রবণতা একপ্রকার মানসিক বিকার ও বিকৃতির জন্ম দেয়। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বে তাই যৌন বিকার এর কথাও বলা হয়ে থাকে। এ সকল বিকারগুলিও যৌন মনস্তত্ত্বের বিষয়। এছাড়াও ফ্রয়েড তাঁর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় লিবিডো, লিবিডো ফিক্সেশন ও লিবিডো রিগ্রেশন (প্রত্যাবৃত্তি)-এর কথাও বলেছেন।

'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিকতার উন্মোচন ও অনুসন্ধানের প্রথম পর্বেই আমাদের কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। প্রথমতঃ এ উপন্যাস উনবিংশ শতাব্দীর সেই আর্থসামাজিক কথাচিত্র যেখানে নিখিলেশ নামক একটি জমিদার তনয় ও স্ত্রী বিমলাকে কেন্দ্র করে তাঁর গার্হস্থ্য জীবনের প্রেক্ষাপটটিকে লেখক উপন্যাসের মূল পটভূমি করে তুলেছেন। নিখিল-বিমলার সম্পর্কসূত্রের মধ্যে দিয়ে অনেকগুলি বিষয় উঠে এসেছে

যেমনঃ পারিবারিকতা, স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্ক, নারীর ব্যক্তি চৈতন্য ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ, ঐতিহ্য ও সংস্কারের পাশাপাশি নারীমনে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নতুনতর তথা আধুনিক ধারণার জাগরণ ও তার উত্তরণ ঘটাতে তার মানসিক জোর ইত্যাদি। উপন্যাসে নিখিলেশের মনের গঠনকে নিম্নরূপে দেখানো যায়:

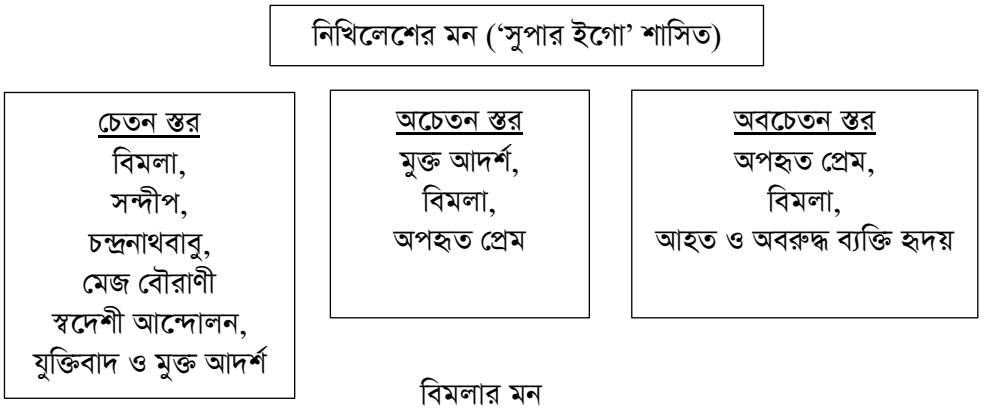

বিমলার মন

বলাবাহুল্য নিখিলেশের আত্মকথায় বিমলা সম্পর্কিত তাঁর ভাবনাগুলির মধ্যে দিয়ে তাঁকে স্বতঃই এক মুক্তমনা মনের পথিক বলেই মনে হয়। যখন সে বলেঃ

> *"আমার স্ত্রী, অতএব ও আমারই! ও যদি বলতে চায়, না, আমি আমিই, তখনই আমি বলব-সে কেমন করে হবে, তুমি যে আমার স্ত্রী! স্ত্রী? ওটা কি একটা যুক্তি? ওটা কি একটা সত্য? ঐ কথাটার মধ্যে একটা আস্ত মানুষকে আগাগোড়া পুরে ফেলে কি তালা বন্ধ করে রাখা যায়?"*

নিখিলেশ নারী-পুরুষের সম্পর্ক এমনকি স্বামী-স্ত্রীর স্বভাবজ সম্পর্কের গণ্ডি কেটে বিমলাকে কতখানি মুক্তি দানে প্রয়াসী হয়েছিল তা তার **এ উদ্ধৃতি থেকে** সহজেই অনুমান করা যায়। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের নায়ক নিখিলেশ অবক্ষয়গ্রস্ত রাজপরিবারের সুশিক্ষিত, চরিত্রবান, প্রগতিবাদী আধুনিক যুবক যে স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক সম্পর্কিত জীবনে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশেষ আস্থাবান। তৎসহ তার আস্থা শুধু তত্ত্বকেন্দ্রিক নয়, কারণ সে সর্বান্তকরণেই চাইতো যে তার স্ত্রী বিমলাও বাইরের সকলের সাথে মিশে নিজের ব্যক্তিসত্তাকে বিকশিত করে তুলুক। বিশ্বের সত্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যদি সে নিজের সত্য পরিচয়খানিকে তুলে ধরতে পারে, নিজের পরিচয় পাকা করতে পারে তবেই তাদের ভালোবাসা সার্থক হবে, এই ছিল তার আদর্শ। তাই সে বিমলাকে স্বামী-স্ত্রীর সকল নিয়মতান্ত্রিকতার বাঁধন থেকে মুক্তি দিয়েছিল। বিমলার এই মুক্তি যে বাইরের জীবনকে কেন্দ্র করে, নিখিলেশের অবচেতনে তা কিভাবে বিস্তৃত হয়েছিল তাঁর স্বরূপও নিখিলেশের একটি উক্তির মর্মার্থে মেলেঃ

> *"একদিন বিমলকে বলেছিলুম, তোমাকে বাইরে আসতে হবে। বিমল ছিল আমার ঘরের মধ্যে-সে ছিল ঘর-গড়া বিমল, ছোটো জায়গা এবং ছোটো কর্তব্যের কতকগুলো বাঁধা নিয়মে তৈরী। তাঁর কাছ থেকে যে ভালোবাসাটুকু নিয়মিত পাচ্ছিলুম সে কি হৃদয়ের গভীর উৎসের সামগ্রী, না সে সামাজিক ম্যুনিসিপ্যালিটির বাষ্পের চাপে চালিত দৈনিক কলের জলের বাঁধা বরাদ্দের মতো?"*

মনে রাখতে হবে, বিমলা স্বেচ্ছায় বাঁধনকাটা খাঁচার পাখি নয়, খাঁচার ভিতরে থেকে ছটপট করা মুক্তি প্রত্যাশী বিহঙ্গিনীও নয়, 'ঘর' যদি তার শেকল হয় তবে সেই শেকলের বেড়ী কেটেছে নিখিলেশ নিজে। একইসাথে লক্ষণীয় নিখিলেশের মনে বিমলার ভালোবাসাকে ঘিরে যে সংশয় আছে তার কোথায় যেন বা আছে একটা অতৃপ্তিও। সেই

অবচেতনার অতৃপ্তিই কি চেতন মনে তাকে ঘিরে রচনা করা সকল গণ্ডির ঘেরাটোপ থেকে বিমলাকে মুক্তি দিতে চেয়েছে?

নিখিলেশের শিক্ষা, যুক্তিনিষ্ঠ ও মুক্তচিত্ত মনোভাব, প্রজাবাসীর জন্য তাঁর অনুকম্পা ও দয়ার্দ্রচিত্ততা, নারীশিক্ষা ও নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাস, পোষাকে-আশাকে ও রুচিশীলতায় আধুনিকতার ছাপ (ইউরোপীয় বিপণি থেকে সে বিমলার জন্য পোশাক আনিয়েছে) সবই উনবিংশ শতাব্দীর এই নব্য বঙ্গ চরিত্রটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে উপন্যাসে চোখে পড়ে। সেইসঙ্গে চোখে পড়ে তার জমিদারী আভিজাত্য ও উন্নাসিকতা। কিন্তু একইসঙ্গে তাঁর জীবন দর্শন, ব্যক্তি অনুভব ও যে মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতি ও ধ্যানধারণাগুলির কথা লেখক বলেন তা লেখকের নিজস্ব ধ্যানধারণার সাথেও অনেকখানি মিলে যায়। চন্দ্রনাথবাবুর সেই বিখ্যাত উক্তিঃ

> *"এ সব তর্ক করবার কথা নয় নিখিল। আমাদের ভিতরেই এবং সকলের মূলেই যে একটি বিরাট সত্য আছে এ কথা যে লোক নিজের ভেতর থেকেই উপলব্ধি না করতে পারে সে লোক কেমন করে বিশ্বাস করবে যে, সেই অন্তরতম সত্যকেই সমস্ত আবরণ মোচন করে প্রকাশ করাই মানুষের চরম লক্ষ্য, বাইরের জিনিসকে স্তূপাকার করে তোলা লক্ষ্য নয়।"*

এখানেই কিন্তু 'ঘরে-বাইরে' নামকরণের একটা মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্যও পেয়ে যাই। এ 'ঘর' নিখিলেশের অন্তর মহল যেখানে স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশীয়ানা সম্পর্কে চন্দ্রনাথবাবুর গড়ে তোলা আইডিয়ার সারকিটটাই সত্য, তা সত্য পথের দিশারী আর 'বাইরে'টা হলো উদ্দেশ্যলোভী সন্দীপের ভণ্ড স্বদেশপ্রীতির মোহে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ছুটে চলা বাস্তবের বিমলা। সন্দীপের সাথে নিখিলেশের আইডিয়ার লড়াই এ সন্দীপের পুরোটাই ফাঁকি, যদিও নিখিলেশের কাছে স্বদেশ সম্পর্কে চন্দ্রনাথ বাবুর কাছ থেকে পাওয়া আইডিয়ার সত্যও কখনো কখনো কখনো ঝাপসা হয়ে যায় সন্দীপ নামক রাহুগ্রস্ত বাস্তবের বিমলার কাছে। তাই সে বলতে পারেঃ

> *"বাস্তবকে যত একান্ত করে দেখি ততই সে আমাদের পেয়ে বসে---আভাসমাত্রে সত্যকে যখন দেখি তখনই মুক্তির হাওয়া গায়ে লাগে। বিমল আজ আমার জীবনে সেই বাস্তবকেই এত বেশী তীব্র করে তুলেছে যে, সত্য আমার পক্ষে আচ্ছন্ন হবার জো হয়েছে। তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথাও আমার দুঃখের আর সীমা খুঁজে পাচ্ছি না।"*

নিখিলের এ উক্তি থেকে বস্তুতই তার প্রজ্ঞালালিত সত্য বোধের থেকেও বাস্তবের বিমলার জন্য তার অভাববোধ, বিমলার প্রতি তার ভালোবাসা ও সেই ভালোবাসা বোধ থেকেই বিমলাকে হারানোর ভীতি-এর সবটাই অবচেতন মনের উৎকণ্ঠা ও দুঃখবোধে তাড়িত হয়েছে। যদিও তারপরই চন্দ্রনাথবাবুর জীবনের বাতায়ন থেকে দেখা সত্যের নিশ্ছিদ্র ঘেরাটোপেই নিখিলেশ পুনরায় আশ্রয় নিতে চেয়েছে। তাই সে বলেছেঃ

> *"যত দুঃখ, যত ভুল, সব যে ঐ সত্যকে না পেয়ে। সেই সত্যকে জীবন ভরে না নিয়ে দিন-রাত এমন করে কেমনে কাটবে? আর তো পারি নে, সত্য, তুমি এবার আমার শূন্য মন্দির ভরে দাও।"*

এক বিমূর্ত আদর্শের ধ্বজাধারী নিখিলেশ সন্দীপের নীতিহীন জীবনচর্চার কাছে পরাজিত। ক্ষতবিক্ষত রাজা অথবা সৈনিকের অসহায়তায় সে শুধু দেখে গেছে প্রজাবাসী মানুষের মনুষ্যত্বের অপমান। সন্দীপের কার্যকলাপে নিখিলেশ একসময় নিখিলেশের ন্যায় স্বদেশীওয়ালাদের সম্পর্কে ভাবতে শুরু করেছে যে সর্বত্র 'ভৈরবী চক্রে মদের পাত্র' নিয়ে তারা বলেছে যে তাদের 'ভালোবাসা সেই দেশের প্রতি তেমন নয় যেমন নেশার প্রতি।' কিন্তু বাস্তবে নিখিলেশ কখনই সন্দীপের ভন্ড স্বাদেশিকতার স্পষ্ট প্রতিবাদী হতে পারে নি কারণ, সন্দীপ নামক পশুপ্রবৃত্তির দ্বারা রাহুগ্রস্থ বিমলাকে হারানোর বেদনা যেমন একদিকে তিল তিল করে তার মানসিক শক্তিক্ষয় করেছিল তেমনি তার নিজেরই তৈরী উদার আদর্শের পথ ধরে স্বেচ্ছায় ধাবমান বিমলাকে সর্বনাশী নেশার স্রোতে পিছলে যেতে দেখেও সে সম্পূর্ণভাবে অসহায় দর্শকের ন্যায় নিশ্চেষ্ট ও নিরুত্তাপ ছিল। হয়তো তার অবচেতন মন

পৌরুষত্বের এই পরাজয় মেনে নিয়েছিল, হয়তো একদা তার মনে হয়েছিল দোষ বিমলার তত নয়, যত নিখিলেশের। বঞ্চনা সে করেছিল, ভালোবাসার নামে করেছিল জবরদস্তি। তাই প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নিয়েছে। উপন্যাসে দেখি বিমলাকে না পেয়ে ব্যর্থ মনোরথ নিখিলেশ বারে বারে সত্যের ছত্রছায়ায় নিজের আড়াল খোঁজার চেষ্টা করেছে। নিখিলেশের এই যে সত্যের ছত্রছায়ায় বারংবার নিজের আড়াল খোঁজার চেষ্টা, এই যে অহেতুক জীবন থেকে পলায়নের ও ব্যর্থ ভালোবাসা ঢাকার অপচেষ্টা তা কি নিখিলেশের অবচেতনার গ্লানি আর পরাভবকেই স্পষ্টায়িত করে না? উপন্যাসে নিখিলেশ চরিত্রের ট্রাজেডীর বীজও নিহিত এখানেই।

উপন্যাসের প্রায় শেষপর্বে 'নিখিলেশের আত্মকথা'য় দেখি নিখিলেশের শান্তির নীড় ধ্বংসপ্রায়। নিজ শয়নকক্ষে আজ সে নিঃসঙ্গ, কায়াহীন প্রেতাত্মার মতো একাকী রাত কাটায়, নিজের ছায়াকল্পের অস্তিত্বে নিজেই শংকিত হয়ে ওঠে। প্রায় এক দশকের পতিব্রতা ঘরনী বিমলা-যাকে সে তার স্বাধিকার, তার আধিপত্য থেকে মুক্তি দিয়েছে। কোথায় সে? নিখিলেশ জীবনটাকে পিছন ফিরে দেখতে গিয়ে আবিষ্কার করেছে সে কাউকে, এমনকি বিমলাকেও কখনো মনেপ্রাণে ভালোবাসতে পারে নি। কখনও কখনও তার মনে হয়েছে সে তার আইডিয়া অথবা আদর্শের যূপকাষ্ঠে বিমলাকে বলি দিয়েছে। যখন সে বলেঃ

> *"এতদিন আমি আমারই মনের কতকগুলি দামী আইডিয়াল দিয়ে বিমলাকে সাজিয়েছিলাম। সে প্রতিচিত্র ভুল।"*

তখন এ উক্তিতে তার হৃদয়ের গভীর ক্ষতচিহ্নটুকুই চোখে পড়ে। আবার যখন নিখিলেশ বলে:

> *"ভালোবাসার ত মূল্য তাই, সে যে অযোগ্যতাকেও সফল করে তুলে। যোগ্যের জন্য পৃথিবীতে অনেক পুরস্কার আছে। অযোগ্যের জন্যই বিধাতা ভালোবাসাটুকু রেখেছেন।"*

তখন মনে হয় এ নিখিলেশের নিজের অযোগ্যতা সম্পর্কে নিজের মনের কাছেই এক জবাবদিহি। কখনও মনে হয় এ তার অযোগ্যতার অকপট আন্তরিক স্বীকারোক্তি,আর এই স্বীকারোক্তির মধ্যে দিয়েই অবচেতন মনে নিখিলেশ স্ত্রী বিমলার কাছে হারার আগেই পুরোপুরি তার হার স্বীকার করে নিয়েছে। তবে লেখক যাই বলুন আমরা বলবো, নিখিলেশের অবচেতন মনের এ ভাবনা সত্য নয় বরং এ তার মহত্ব, এক আত্মক্ষয়ী উদারতা। সে উপন্যাসের বর্ণহীন, ব্যক্তিত্বহীন চরিত্র নয়। সুকঠিন আদর্শের আবরণ দিয়ে সে তার ভালোবাসাকে শুধুমাত্র আড়াল করতে চেয়েছিল, মনে-প্রাণে বাঁধতে চায় নি। কিন্তু বিমলার প্রতি যে উদারতা ও প্রশ্রয় সে প্রদর্শন করেছিল সেই উদারতাই শেষপর্যন্ত তার সকল ভালোবাসাকে প্রকাশ করে দিয়েছে। আবার সেই উদারতাই শেষপর্যন্ত ক্ষমা, প্রেম ও তিতিক্ষার মন্ত্রে উদযাপিত হয়ে বিমলাকে পুনরায় গ্রহণ করতেও সাহায্য করেছে। সুতরাং ব্যর্থ দাম্পত্যের ভালোবাসার যা কিছু দায় তা হয়তো বিমলাকেই দিতে হয়। নিখিলেশের অবচেতনে বিমলার প্রতি তার ভালোবাসা পলি চাপা পড়লেও তাতে মালিন্যের স্পর্শমাত্র ছিলনা, কারণ তাতে লেগে ছিল তারই দেওয়া আদর্শের প্রতি নিখিলেশের গভীর আস্থা ও বিশ্বাস। তার ভাবনায় 'সত্যের সম্পূর্ণ অনাবৃত রূপ' সহ্য করবার শক্তি নিশ্চয় তার বিমলের আছে। গোটা উপন্যাসের কোথাও নিখিলেশ-বিমলার দাম্পত্যপ্রেম কলুষ মথিত নয়, বরং তা আদর্শে সুরভিত। এবং এর গোটা কৃতিত্বই নিখিলেশের। প্রেমও যে যৌনতার সীমা অতিক্রম করে একটা বড় আইডিয়ার জগৎ তৈরী করতে পারে যেখানে নারীর স্বাধিকার ও পুরুষের বিশ্বাস একই আদর্শ-সূত্রে গাঁথা হতে পারে উপন্যাসে নিখিলেশ তার প্রমাণ দিয়েছে। সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্বের সূত্রানুযায়ী মানুষের অবচেতন মন শাসিত হয় 'সুপার ইগো' দ্বারা। প্রত্যেক মানুষের অবচেতন মনের অনাচারী, পাপাচারী প্রবৃত্তিগুলিই 'সুপার ইগো' দ্বারা অনুশাসিত হয়। যে মানুষের 'সুপার ইগো' (Super Ego) বা Self Image যত প্রবল সেই-ই তত বেশী ন্যায়পরায়ণ, বিবেকবান ও বুঝমান হয়। কারণ 'সুপার ইগো' দ্বারা শাসিত বা তাড়িত অন্যায় ও অপরাধমূলক প্রবৃত্তিগুলি মনের চেতনার দ্বারে

পৌঁছতে পারে না, অন্ধকার অবচেতনেই মাথা কুটে মরে। নিখিলেশ চরিত্রে এই 'সুপার ইগো'র সন্ধান পাওয়া যায়। তার ধৈর্য, স্থৈর্য ও প্রজ্ঞা তারই পরিচায়ক।

নিখিলেশের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে আরোও কয়েকটি দিক ধরা পড়ে। একদিকে অমূল্যর জবানবন্দী বিমলার প্রতি নিখিলেশের মনের সন্দেহ নিরসনে সাহায্য করেছে, অন্যদিকে ভাগ্যবঞ্চিতা, পতিপুত্রহীনা মেজরানীর নয় বৎসর বয়সে বিবাহের পর রাজবাড়ীতে আসা ও তখন থেকেই ছয় বৎসরের ছোট দেবর নিখিলেশের সাথে তার জীবনকথার ইতিবৃত্ত উপন্যাসের পরিণামী বেদনাময় দুর্ভাগ্যের প্রেক্ষিতে (নিখিলেশের মৃত্যু) বড়ই করুণ বলে মনে হয়। উপন্যাসের একেবারে শেষে চরম নিরীহ ও শান্ত নিখিলেশের দাঙ্গা থামাতে ঘোড়ায় চড়ে তীব্রভাবে ছুটে বেড়িয়ে যাওয়া ও মৃত্যুর (উপন্যাসের কাহিনীটি নিখিলেশের মৃত্যুর পর বিমলার বৈধব্য জীবনপর্ব থেকেই বর্ণিত হয়েছে) বাস্তবতা আর শিল্পরীতি নিয়ে যতই সমালোচনা থাক (নিখিলেশ 'বউ ঠাকুরাণীর হাট'-এর প্রতাপাদিত্য-পুত্র উদয়াদিত্য নয় যে খুল্লতাতকে পিতার গভীর ষড়যন্ত্রের হাত থেকে বাঁচাতে সংবাদ পাওয়া মাত্র পাকা সৈনিকের মতো নিমেষে নিকষ কালো অন্ধকার রাত্রে ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়িয়ে পড়বে) মনস্তত্ত্বের নিরিখে এর একটা পৃথক ব্যাখ্যা আছে। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বে মানুষের জীবনমুখী প্রবণতা ও মৃত্যুমুখী প্রবণতার কথা বলা হয়। রামায়ণের কালেও সতী নারী সীতাকে তার অক্ষুণ্ণ সতীত্বের প্রমাণ স্বরূপ অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছিল, কিন্তু তাতে রাম-সীতার মিলন সম্পূর্ণ হয়নি। ফলতঃ অবমানিতা সীতা স্বেচ্ছায় ভূমিগর্ভে আত্মবিসর্জন করেছিলেন। নিখিলেশের যে আহত মন প্রাণপন শক্তিতে হৃতহৃদয় বিমলাকেই শেষপর্যন্ত ভালোবাসতে চেয়েছে, বিমলাকে পাওয়া সম্পূর্ণ হলে তাই-ই নীরব অভিমানে আত্মোৎসর্গের মধ্যে দিয়ে সেই মিলনযজ্ঞকে এক চরম নিষ্পত্তি দান করে গেছে। নিখিলেশের মৃত্যু তাই এক নিছক মৃত্যু অথবা দুর্ঘটনা নয় বরং তা এক বঞ্চিত, অভিমানবিক্ষুব্ধ প্রেমিক হৃদয়ের বেদনাদীর্ণ আত্মাহুতি বলেই মনে হয়।

সন্দীপকে এ উপন্যাসের এক আগ্রাসী জীব বলে ধরে নেওয়াই শ্রেয়। তার কতটা অংশ মানুষ আর কতটা পশু সে তর্কে না গিয়েও বলা যায় পাশবিক প্রবৃত্তি এ উপন্যাসে তার মনুষ্যত্বকে শেষমেশ নির্মম ভাবে হত্যা করেছে। উপন্যাসে নিখিলেশের বিপ্রতীপ মেরুতে সন্দীপের অবস্থান। উপন্যাসে 'সন্দীপের আত্মকথা' যেন তার স্বহস্তে অঙ্কিত আদিম, প্রকৃতিবশ্য, নখদন্তবিস্তারী বর্বর মানুষের এক দানবীয় প্রতিকৃতি। যখন সে বলে:

"আমরা পৃথিবীর মাংসাশী জীব; আমাদের দাঁত আছে, নখ আছে; আমরা দৌড়তে পারি, ধরতে পারি, ছিঁড়তে পারি।" কিংবা "প্রকৃতি আত্ম সমর্পণ করবে, কিন্তু সে দস্যুর কাছে।" অথবা "হয় চুরি করব, নয় ডাকাতি করব।" তখন এসব শুধুমাত্রই আর তার নিভৃত মনের 'আত্মকথা' মাত্র থাকে না, নিখিলেশ অথবা বিমলার সাথে কথায়-বার্তায়, তর্কে-বিতর্কে তার সদম্ভ ও সগর্ব স্বীকৃতিও হয়ে ওঠে। এ থেকেই এ হেন এক নীতিহীন, আদর্শহীন, ভন্ড দেশসেবক ও বিশ্বাসঘাতক বন্ধুকে চিনে নিতে আমাদের এতটুকু অসুবিধা হয় না। সন্দীপের মনের গঠনকে নিম্নরূপে দেখানো যেতে পারে:

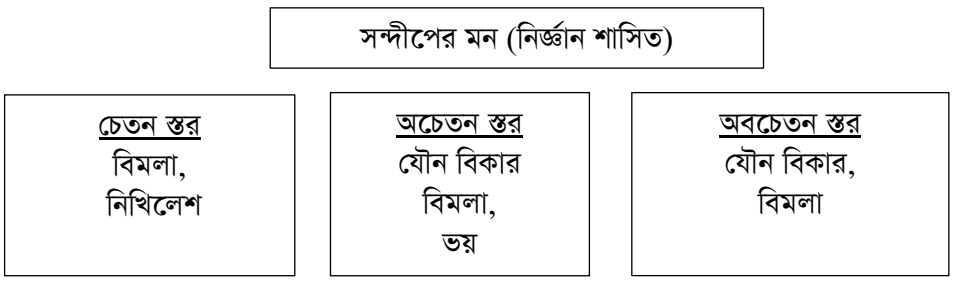

বিমলার মন

রবীন্দ্র উপন্যাসে অস্বাভাবিক যৌন মনস্তত্ত্বকে (Abnormal Sexuality or Psycho Sexuality) সরাসরি খুঁজে পাওয়া যায় সন্দীপ চরিত্রের মধ্যে। পাষণ্ড সন্দীপের অপ্রাকৃত শক্তির মায়াময়, মোহময় ইন্দ্রজালে সম্মোহিত হয়ে অন্তঃপুরের বুদ্ধিভ্রংশ সাধ্বী বধূ তার জীবন-যৌবন প্রায় তার পায়ে উৎসর্গ করতে বসেছে আর নকল দেশসেবকের বিজয় দুন্দুভি সেইক্ষণে দুর্বলচিত্ত নারীর করুণ আত্মনিবেদনের সঙ্গে মিলে-মিশে এক সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী মহতী বিনষ্টির আয়োজন সম্পূর্ণ করেছে। যে ব্যক্তি একদা ভক্তদের কাছে তার বিক্রম দেখাবার জন্য একটি নিরীহ ছাগশিশুকে চারণভূমি থেকে ধরে এনে জীবন্তাবস্থায় স্বহস্তে দা দিয়ে তার একটি পা কেটে ফেলতে পারে সে যে কত ভয়ংকর মনের হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। জমিদার বন্ধু নিখিলেশের বদান্যতায় রাজকীয় কেতায়, সুখভোগে সে শুধু তার জীবনই কাটায় নি, সুযোগের সদব্যবহারে এতটুকু কুণ্ঠা প্রকাশ না করে বন্ধুপত্নীর নারীত্বের চরম সর্বনাশ সাধনেও উদ্যত হয়েছে। প্রেমের ছলনায় প্রায় বশ করে কামনার গ্রাসে সে নিখিলেশের স্ত্রী বিমলাকে নিজের করায়ত্ত করতে চেয়েছে। তার অস্থির চঞ্চলতা, কামনার উদ্দামতা, 'সুপার ইগো'র (Super Ego) শাসনহীন অবাধ্য অবচেতন এক বন্য, আদিম, সমাজ অননুমোদিত প্রবৃত্তিরই বিস্ফোরক প্রকাশকে জন্মদান করেছে। তার অবচেতন মনের অবাধ্য পংকিল বাসনারা 'সুপার ইগো'র বাধা কাটিয়ে বল্গাহীন ভাবে চেতন মনে এসে পড়েছে। ক্রমশঃ তার চেতন মনকে সম্পূর্ণভাবে শাসন করেছে তার অবচেতন। ফলতঃ একসময় সন্দীপ যেন স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে গৃহবধূ বিমলার মুখের ওপর থেকে ন্যায়-অন্যায়ের ঘোমটা উড়ে গেছে। আর তাই সে ভাবতে পেরেছে:

> *"জনসমুদ্রের ঢেউয়ের উপর দুলবে তরী, উড়বে তাতে বন্দেমাতরম্ জয়পতাকা চারিদিকে গর্জন আর ফেনা---সেই নৌকোই একসঙ্গে আমাদের শক্তির আর প্রেমের দোলা।"*

এ হলো স্বার্থান্বেষী সন্দীপের নিজের মতো করে ভাবা অবচেতন মনের অনুভব। আসলে স্বদেশী আন্দোলনের জনজোয়ারের উচ্ছ্বাস, আবেগ, বিমলার মধ্যে দিয়ে জগজ্জননী দেশমাতৃকার আবাহন আর ব্যক্তিগত কুটিল কামনা-বাসনাকে একই মদিরার পাত্রে মিশিয়ে যেন সে তা বিমলাকে পরিবেশন করেছে। বাছা বাছা শব্দে যে নিরবচ্ছিন্ন স্তুতি নিরন্তর সে করে গেছে তার ঘৃণ্য স্বরূপ বিমলা প্রথম দিকে ধরতে পারে নি। একসময় তার অবচেতনে বিমলা এই নিরাবরণ জ্ঞানপাপীর সৃষ্ট মোহজাল রূপ আসন্ন বিপদের আভাস পেলেও সেই মোহের ঘোরে আর তীব্র চোরা টানেই খড়কুঠোর মতো সে ক্রমশঃ তার দিকেই এগিয়ে গেছে। এমন কি 'বন্দেমাতরম'-এর মতো পবিত্র মন্ত্রকেও এই হঠকারী লোভী কামুক তার বাক্যবন্ধে বারংবার ব্যবহার করে তার অপমানই করেছে। এখানে বিমলার প্রতি উচ্চারিত স্তুতিবাক্যগুলির মধ্যেই সন্দীপের রিরংসা ও অনাবৃত কামনাকে প্রত্যক্ষ করা যায়। সন্দীপের স্তুতিঃ

> *"আমার সমস্ত দেশের মধ্যে আমি তোমার সেই বিরাট রূপ দেখেছি। তোমারই গলায় গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সাতনলী হার; তোমারই কালো চোখের কাজলমাখা পল্লবে আমি দেখতে পেয়েছি নদীর নীল জলের বহুদূর পারের বনরেখার মধ্যে...তোমার নিষ্ঠুর তেজ দেখেছি জৈষ্ঠ্যের যে রোদ সমস্ত আকাশটা যেন মরুভূমির মতো শুষতে থাকে...তোমারই মুরতি গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।"*

বলাইবাহুল্য এমন স্তুতি কোনো নারীকে অজানা স্বপ্নময় রোমান্সের জগতে ভাসিয়ে অথবা উড়িয়ে নিয়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট। উপন্যাসে এমন স্তুতি আরও অনেক আছে। নারীমনে মোহ সৃষ্টিকারী ভাষার জাদুকর সন্দীপের কারসাজি বা কূটকৌশলকে লেখক চমৎকার শিল্পকলায় ফুটিয়ে তুলেছেন। মাকড়সা যেভাবে জাল পেতে তার জালে আবদ্ধ নিশ্চিত শিকারের দিকে লোভী অথচ ধীর পদক্ষেপে একটু একটু করে এগিয়ে যায় সন্দীপও এখানে তেমনভাবেই শেষপর্যন্ত নিজের জালে বিমলাকে আটকে তাকে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ও নিষ্পিষ্ট করতে চেয়েছে।

মনস্তত্ত্বের এক বড়ো শাখা হিপনটিজমের কথা এখানে বলা হয়েছে। সন্দীপ যে কৌশলে বিমলাকে আয়ত্ত করতে চেয়েছে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় তা হিপনটিজম ছাড়া আর কিছুই নয়। এর সর্বগ্রাসী প্রভাবে একসময় বিমলা

নিজেকে নিজের বশে রাখতে পারে নি, চৌকির উপর থেকে মাটিতে পড়ে গিয়ে তারপর সন্দীপের দুটি পা জড়িয়ে ফুলে ফুলে কেঁদেছে। আর তখন সন্দীপের অনুভব:

> *"এই তো হিপনোটিজম! এই শক্তিই পৃথিবী জয় করবার শক্তি। কোনো উপায় নয়, উপকরণ নয়, এই সম্মোহন। কে বলে সত্যমেব জয়তে? জয় হবে মোহের। বাঙালি সে কথা বুঝেছিল। তাই বাঙালি এনেছিল দশভূজার পূজা, বাঙালি গড়েছিল সিংহ বাহিনীর মূর্তি। সেই বাঙালি আবার আজ মূর্তি গড়বে, জয় করবে বিশ্ব কেবল সম্মোহনে। বন্দেমাতরম্।"*

হিপনোটিজম্ একটি বিজ্ঞান। এর প্রভাবে প্রভাবিত করে কিছুক্ষণ কোনো মানুষকে নিজের বশীভূত করে রাখা যায়। মস্তিস্ক সহ সূক্ষ্ম স্নায়ু-শিরার উপর এর প্রভাবকে কার্যকরী করে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানও অভাবনীয় ফল লাভ করেছে। মানসিক পীড়াগ্রস্ত মানুষের অবচেতন বা নির্জ্ঞান মন থেকে চেতন স্তরে উঠে আসা স্মৃতি অথবা মৃত (অতীত) ঘটনার পুনরুৎপাদন করে তদ্দারা তার মনোরোগের সঠিক চিকিৎসার উপায় নির্দ্ধারণ আধুনিক মনঃচিকিৎসাকে এক যুগান্তকারী সাফল্য দিয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান যদি শয়তানের কুক্ষিগত হয় তবে তার পরিণাম হয় ভয়ংকর। যদিও হিপনোটিজমের সঠিক প্রয়োগ পদ্ধতি সন্দীপের কার্যকলাপে নেই, উপন্যাসে সেভাবে তা দেখানো সম্ভবও নয় কিন্তু, আসলে সন্দীপ বিমলার প্রতি যা করেছে তাকে এককথায় হিপনোটিজম্ ছাড়া আর অন্য কিছু আখ্যা দেওয়াও যায় না। ভাষার জাদুতে বিমলার মনে সে তার লুব্ধ প্রণয়কে দেশমাতৃকার বেদীতে সাজিয়েছে আর ক্রমে তার সম্মোহনী দৃষ্টির সামনে বিমলার কর্মশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে। কিন্তু একথা যেমন সত্য, যে হিপনোটিজমের প্রভাব সকলের উপর কার্যকরী অথবা সমানভাবে কার্যকরী নয়, তেমনই এর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ীও নয়। যে হিপনোটিজমকে সরল ও দুর্বলমনা বিমলার উপর সন্দীপ সহজভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছিল তা যুক্তিবাদী ও কঠোর সত্যসন্ধানী নিখিলেশের উপর প্রয়োগ করা সম্ভব ছিল না। আবার জাতীয়তাবাদী স্বদেশী আন্দোলনে সন্দীপের মতো ভন্ড দেশদরদীদের যাদের নিয়ে কাজ অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান সহ আপামর দেশবাসী তথা নিখিলেশের প্রজাবৃন্দের— উপরও এর কার্যকারিতা ছিল সীমিত। তাই শেষপর্যন্ত ব্যর্থ, প্রতিহত সন্দীপ বন্ধুর তথাকথিত আতিথ্যের প্রতিদানে চক্রান্তে প্রবিষ্ট হয়েছে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা বাঁধানোর পরই উপন্যাস থেকে তার শেষ নিষ্কান্তি ঘটেছে, যার ভয়ংকর পরিণাম নিখিলেশের দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়া ও মৃত্যু। বস্তুতঃই প্রকৃত দেশপ্রেমের বদলে উন্মাদনার উষ্ম লাভায় মানুষকে তাতিয়ে তোলাই যাদের কাজ সন্দীপের ন্যায় সেই সকল ভন্ড দেশপ্রেমিকদের হাত ধরে সেকালে কোনো জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাফল্য আসে নি, স্বাধীনতা তো দূর অস্ত! সন্দীপ চরিত্র সম্পর্কে স্বকালেই লেখককে অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে তর্কেও সন্দীপ বলেছে:

> *"সত্য মানুষের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হচ্ছে ফল লাভ।"*

আর এই ফল লাভ যেন তেন প্রকারেন সিদ্ধ হলেই হলো! কংগ্রেস ছেড়ে আসা সন্দীপ আসলে কোন্ শ্রেণীর স্বদেশীওয়ালা? সে তো প্রকৃত অর্থে তার 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি কণ্ঠে ও বক্ষে ধারন করে ইংরেজদের তৈরী জেলে কারাবরণ করে নি! কিশোর অমূল্যর সাথেও তো তার মস্ত প্রভেদ আছে! দলের কার্য উদ্ধারের উদ্দেশ্যে ঘুষ, জুয়াচুরি, নৌকা ডোবানো ইত্যাদি যা কিছু স্বদেশাত্মক কার্যকলাপের বর্ণনা, জঘণ্যতম অপরাধের ফিরিস্তি উপন্যাসে দেওয়া হয়েছে তার কোনোটার সাথেই তো সমকালীন স্বদেশী রাজনীতি মেলে না! স্বদেশী রাজনীতিতে এ সবই অশ্রুতপূর্ব, ঐ সময়কার অন্যান্য গ্রন্থাবলীতেও তা সহজলভ্য নয়। তবে? তবে উপন্যাসে সন্দীপের আগমন কি উদ্দেশ্যে? তা কি কেবলই নিখিলেশের জমিদারীতে থেকে রাজকীয় সুখ ভোগ আর বিমলার স্তুতি করে মোহগ্রস্ত বিমলার দিকে কামনার লোভী হাত বাড়িয়ে দেবার জন্য? এমন কি সত্যিকারের বিপ্লবী চরিত্র বলে যে অমূল্য উপন্যাসে যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে তাকেও লেখক সন্দীপের অনুচর বানিয়ে তার জাত মেরেছেন। ইতিহাস অনুযায়ী সে কালে স্বদেশী আন্দোলনের পুরোধারা ছিলেন চরিত্রবান, দেশের জন্য উৎসর্গিত প্রাণ। তারা কখনোই

সন্দীপের মতো ভোগ বিলাসী, প্রবঞ্চক ও চরিত্রহীন ছিলেন না। তারা কখনোই অমূল্যর মতো দেশী রিভলবারধারী আদর্শ পথের পথিক কিশোর ও তরুণদের সাহায্যে দেশকে একটা আস্ত ভাটিখানা বানাবার পরিকল্পনা করেন নি। কিন্তু এ উপন্যাসে তা হয়েছে। যে অমূল্য পুলিশের গুলির সামনে মরতে ভয় পায় না, বিপ্লবী শহীদ হতে সাহসী দেশপ্রেমিকের মতো অনায়াসে বুক পেতে দিতে পারে ইংরেজের ছুঁড়ে দেওয়া বুলেটের সামনে, তার সাথে সন্দীপের সখ্যতা এ উপন্যাসে বড়ই অবাস্তব ও অসঙ্গত বলে মনে হয়। যদিও রবীন্দ্রনাথের এ প্রচেষ্টা উগ্র স্বাদেশিকতা ও আদর্শ বিপ্লবী কর্মপন্থার একটা সংযুক্তিকরণ বলে মনে হতে পারে। হয়তো এ সংযুক্তির পিছনে রবীন্দ্রনাথের স্বীয় ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনাও কাজ করেছিল, তবুও বলতে হবে, এ রীতি ভ্রমাত্মক এবং অবশ্যই ইতিহাস সমর্থিত নয়।

এ থেকেই একটি সিদ্ধান্ত উঠে আসে এবং তা হলো, 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে সন্দীপ চরিত্রটি যতখানি না রাজনৈতিক তার চেয়েও অনেক বেশী মনস্তাত্ত্বিক। মনস্তত্ত্বের বিচারে নিন্দা ও গ্লানির পঙ্কতিলকে সবচেয়ে বেশী অভিষিক্তও হয়েছে সন্দীপই। গোটা উপন্যাসে সন্দীপের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের চেয়ে তাকে অনেক বেশী পরিমাণে বিমলার মন জয়ের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকতে দেখা গিয়েছে। বিমলা-সন্দীপের মানসিক টানাপোড়েনটিই এ উপন্যাসে বেশী করে চোখে পড়ে। বাইরের রাজনৈতিক অস্থিরতা, বয়কট আন্দোলন, বিদেশী পণ্য বর্জন (বিমলা বলেছিল স্বামীকে বলে সে হাটের বিলিতি দ্রব্য বর্জন করাবে) ও স্বাদেশিক অনুভূতি নিশ্চয় এ টানাপোড়েনে একটা বড়ো পটভূমিকা যুগিয়েছে, কিন্তু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলেই বোঝা যায় যে এগুলি বাইরের খোলস মাত্র, মুখ্য উদ্দেশ্য হলো সন্দীপের বিমলাকে হাতের মুঠোয় পাওয়া। আইডিয়ার জাদুকর সন্দীপ গোটা দেশটাকে মায়ার তাড়িখানা বানিয়ে নিজের প্রমত্ত হাতের আঙুলের বশে রেখে তাকে খুশীমতো নাচাতে চায়। বিমলা তারই শিকার। বিমলাকে তার 'মক্ষী' নামে সম্বোধন, অত্যন্ত সুকৌশলে, নিত্যনতুন ছন্দে মর্ডান কালের স্ত্রী-পুরুষের হাজারো রকমের সম্বন্ধের কথা ও তার অন্তঃর্নিহিত অর্থ নির্ল্লজ্জের মতো তার সামনে তুলে ধরা, বৈষ্ণব কাব্যের রসালো গান ও কবিতার অবাধ সংমিশ্রণ, বিমলাকে শক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্বের সারাৎসার বলে বর্ণনা এসবই তার অবচেতন মনের আড়ালে থাকা পংকিল কামনারই ছদ্মবেশী রূপ। ক্রমে স্ত্রী-পুরুষের সার্বভৌম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত নর-নারীর যৌন স্বাধীনতার অবাধ অধিকার তত্ত্ব তার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠলে সেই অবচেতন ক্লেদ-পংকিল কামনারই এক উলঙ্গ প্রকাশ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই পর্যায়ের সন্দীপকে আমাদের চিনে নিতে অসুবিধে হয় না। এ পর্যায়ের সন্দীপের সদম্ভ উক্তি:

> *"আমি স্থূল কেন না আমি সত্য, আমি মাংস, আমি প্রবৃত্তি, আমি ক্ষুধা, নির্ল্লজ্জ, নির্দয়। ... আমি বাস্তব। উলঙ্গ বাস্তব আজ ভাবুকতার জেলখানা ভেঙে আলোকের মধ্যে বেরিয়ে আসছে।"*

এই হলো সন্দীপের প্রকৃত রূপ! অবৈধ কামনা প্রত্যাশী সন্দীপের হিংস্র বাসনার নখ-দাঁত যেন বিষাক্ত লালায়, জর্জরিত জ্বালায় এখানে উন্মত্ত হয়ে ফেটে বেরিয়েছে। অশালীন অবচেতন সরাসরি উঠে এসেছে চেতনার রাজ্যে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের লালসা জাগ্রত উদ্বাহুর মতো অন্ধ হয়ে তার আত্ম পরিতৃপ্তির পথ খুঁজেছে।

সন্দীপের ঘৃণা, লজ্জা, ভয় বিবিক্ত তথাকথিত যে 'মর্ডান' মনটির কথা লেখক উপন্যাসে তুলে ধরেছেন তার মধ্যেও তার পাপাচারের ইঙ্গিত আছে। প্রথম যৌবনকাল থেকে যে পথে সে দিশি-ফিরিঙ্গি মেয়েদের 'মর্ডান' করে তুলেছিল সেই একই পথে সে বিমলাকেও 'মর্ডান' করে তুলতে চেয়েছে। এর সাথে নিখিলেশের গড়ে তোলা 'মর্ডানিটি'র সংজ্ঞা মেলে না। নিখিলেশও প্রগতিপন্থী ছিল, ছিল নারী সমাজের নূতনতর সংস্কৃতি ও সংস্কারের পথিকৃৎ। কিন্তু সন্দীপ এ সবের উর্ধ্বে। তার কাছে নিখিলেশের প্রগতিপন্থা অথবা বিগত যুগের গতানুগতিক বিশুদ্ধ প্রকৃতিবাদী আদর্শ কোনোটাই কোনোকালেই গ্রাহ্য অথবা গ্রহণের বিষয়বস্তু ছিল না। তার কাছে:

> *"প্রবৃত্তিকে বাস্তব বলে স্বীকার ও শ্রদ্ধা করাই হচ্ছে মর্ডান।"*

বলাইবাহুল্য এ প্রবৃত্তি হলো নারীমাংসলোলুপ আদিম রিপু তাড়িত প্রবৃত্তি। তার কত ঘৃণ্য মন, তাই সে বিমলা সম্পর্কে ভাবতে পারেঃ "ও আমাকে চায়, ও তো আমার স্বকীয়া।" সে যেন 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের চক্ষুকর্ণহীন ক্ষুধাসর্বস্ব জন্তুটির মতো, আদিম অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহাপথে যে শচীশের সকল পার্থিব অস্তিত্বকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিল। বাসনার অন্ধকারাচ্ছন্ন অবচেতনার রূপকে লেখক সেখানে যে ভাবে ও যে অর্থে তুলে ধরেছেন তা থেকেও এ রূপ অনেক বেশী ভয়ংকর। সন্দীপের হাতে নারী-পুরুষের মিলনরীতি সংক্রান্ত পুস্তকাবলী ও বিমলা সম্পর্কে তার স্বকপোলকল্পিত অতি উচ্ছসিত উপলব্ধি (বিমলার বাইরের সাজ যতই সাধ্বী স্ত্রীর হোক্ পৃথিবীর রূপরস আস্বাদনের কামনা তার প্রবল) তাকে ক্রমশঃ এক যৌন বিকারগ্রস্ত লম্পটে পরিণত করেছে।

'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে বিমলার মনস্তাত্ত্বিক ভাবনাই বিশেষ বিশ্লেষণের দাবী রাখে। বিমলার মনস্তত্ত্বের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব হলো এ উপন্যাসে সে চেতন ও অবচেতন মনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী ভারসাম্য রক্ষা করেছে। নিখিলেশের মনস্তত্ত্বে যেমন চেতনরাজ্যের ভূমিকাকে প্রবল হতে দেখি তেমনই সন্দীপের মনস্তত্ত্বে অবচেতন বা নির্জ্ঞান মনের আধিপত্যকে লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসে বিমলা এ দুই-য়ের মধ্যবর্তী এক সমান্তরাল ক্ষেত্রে (Liner Position) অবস্থান করছে। বিমলার মধ্যে দিয়ে লেখক মনের চেতন, অচেতন ও অবচেতন তিনটি স্তরকেই দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। বিমলার মনের গঠনকে নিম্নরূপে দেখানো যেতে পারে।

বিমলার মন (চেতনে-অবচেতনে দোলায়িত)

চেতন স্তর	অচেতন স্তর	অবচেতন স্তর
নিখিলেশ, মেজ বৌরাণী, অমূল্য	স্বদেশী আন্দোলন, সন্দীপ, অমূল্য	অবদমিত যৌনতা, আহত বিবেক, সন্দীপ, নিখিলেশ

বিমলার মন

ভাগ্যের প্রসাদে গরিবের কন্যার রাজপুত্রের ঘরণী হওয়া, এমন স্বামীর ভালোবাসার সুবাদে স্বদেশী যুগে অন্দরের গণ্ডিবদ্ধ ঘেরাটোপ থেকে বাইরের সীমাহীন জীবনমঞ্চে বেরিয়ে আসার সুযোগ ও তার ফল বিমলার প্রথম আত্মকথায় নিষ্ঠার সাথে বর্ণিত হয়েছে। তবে বিমলা তার আত্মকথায় তার সতীত্বের দৃপ্ত নিশান উচ্চকণ্ঠে তুলে ধরলেও তার অবচেতনের কোথাও একটা স্থূলতা অথবা দুর্বলতাকে তার স্মৃতিচারণায় বিদ্যুৎফলকের ন্যায় খুঁজে পাওয়া যায়। স্বামীর সম্মানিত অতিথির (সন্দীপ) কাছে তার সাজসজ্জার মোহিনীরূপ স্বভাব সুন্দরী বিধবা মেজ'জার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। সন্দীপকে প্রথম দর্শনে দেখেই বিমলার মনে হয়েছেঃ "কালপুরুষের নক্ষত্রের মতো সন্দীপবাবুর উজ্জ্বল দুই চোখ।" বলা যায়, এই পর্ব থেকেই সন্দীপ সম্পর্কে একটি অলীক, মায়াময়, স্বপ্নাচ্ছন্ন জগৎ বিমলার অবচেতন মনে তৈরী হয়েছে। পরবর্তীকালে সন্দীপের বিমলা-স্তুতি সেই অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়েছে। আরও পরে যখন বিমলার কাছে সন্দীপ "অমরলোকের মানুষ" হয়ে উঠলো আর সন্দীপের বলা স্বাদেশিকতার বিস্ফোরক বাণী বিমলার রক্তে দোলা লাগালো তখন যুগের তুফান যেন একমুহূর্তে আছড়ে পড়লো বিমলার ভাবতরঙ্গে যার কেন্দ্রবিন্দু হলো সন্দীপ, কারণ বাইরের জগতকে রাজ-অন্দরমহলের বিমলা দেখতে চেয়েছিল এবং দেখতে পেরেছিল সন্দীপবাবুর মনের দূরবীণ দিয়েই। আর তাই শেষমেশ বিমলার মন 'নবযুগের আবিরে' লাল হয়ে উঠেছিল।

ঘরে-বাইরে উপন্যাসের নায়িকা বিমলার রাজবাড়ীতে আগমন ঘটেছিল ছোটরাণী হিসাবে। তার আত্মকথায় জানা যায়, সে দেখতে মোটেও সুন্দরী ছিল না, তবে জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনানুযায়ী বলা হয়েছিল সে সুলক্ষণা ও সতীলক্ষ্মী হবে। তার বাইরের গড়ণ ছিপছিপে, শ্যামলা হলেও মনের দীপ্তিতে সে নিখিলেশকে মুগ্ধ করেছিল। নিখিলেশের ভাষায়:

> *"বিমল যে প্রাণের বেগে একেবারে ভরা। সেইজন্যে এই ন'বছরে (বিবাহিত জীবনের) এক মুহূর্তের জন্য সে আমার কাছে পুরনো হয়নি।"*

এ থেকেই বোঝা যায়, অন্তরের দিক থেকে বিমলা স্বামী নিখিলের কাছে কতটা প্রিয়তমা ছিল। বিমলার শিক্ষা-দীক্ষা যা কিছু তার সবই হয়েছে তার বিবাহের পর স্বামীর চেষ্টায় ও স্বামীরই একান্ত সহযোগিতায়। বিদেশী মহিলা মিস গিলবির তত্ত্বাবধানে নিখিলেশ বিমলার শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে। ইউরোপীয় বিপণি থেকে সে বিমলার জন্য বিদেশী পোষাকও আনিয়েছে। এ থেকেই বিমলার প্রতি নিখিলেশের ভালোবাসার পরিমাণ উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু শুধু পোষাক-আষাক, শিক্ষা-দীক্ষার মতো পার্থিব সুখই নয়, বিমলা নিখিলেশের কাছ থেকে পেয়েছিল তার অন্তরের উজ্জ্বল আদর্শকে। নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, অন্দরের ক্ষুদ্রতার আড়াল ঘুচিয়ে বাইরের সীমাহীন জগৎ-সংসারের একেবারে মাঝখানটিতে এসে দাঁড়িয়ে পুরুষের সমকক্ষ হয়ে নারীর কর্মোদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার শিক্ষা বিমলার স্বামী নিখিলেশের কাছ থেকেই পাওয়া। ঘর থেকে বাইরের মুক্তাঙ্গনের আলোর দিশা নিখিলেশই প্রথম তাকে দেখিয়েছে। সকল সংস্কারমুক্ত এই আদর্শ, প্রগতিপন্থার এই উজ্জ্বল রাজপথ ধরেই বিমলার অন্তঃচৈতন্যে পরিবর্তনের প্রাথমিক বীজ রোপিত হয়েছে।

উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই, বিমলা স্বামী নিখিলেশের মতো শুধুমাত্র তত্ত্বকেন্দ্রিক হয়েই থাকেনি, রক্তমাংসের মানবীতে পরিণত হয়েছে। একসময় নিখিলেশের অতি ভালোমানুষির প্রতি বিমলার একপ্রকার অবজ্ঞাই ছিল। তাই সে বলেছিল:

> *"আমার মনে হত ভালো হবার একটা সীমা আছে। সেটা পেরিয়ে গেলে কেমন যেন তাতে পৌরুষের ব্যাঘাত হয়।"*

বিমলার এ উক্তি তার দাম্পত্যজীবনের ভালোবাসাহীনতারই ইঙ্গিতবাহী। তবে ঘরের বিমলা যদি নিখিলেশের তাত্ত্বিক সত্যের মুখ্য প্রতিপাদ্য হয় তবে বাইরের বিমলা সন্দীপের জ্বলন্ত বাসনার জীবন্ত যৌনপ্রতিমা। এভাবে বলতে বাধ্য হলাম কারণ 'সন্দীপের আত্মকথা'য় সন্দীপ বিমলাকে আগাগোড়া এভাবেই দেখে এসেছে। আসলে উপন্যাসে বিমলা নামক সত্তাটি অখন্ড নয় বরং ভাবে ও ভাবনায় দ্বিখন্ড। বিমলা এমন একটি মনোগ্রন্থ যার প্রথম অংশের পাঠক নিখিলেশ এবং শেষাংশের সন্দীপ, যার সত্য হতে শুরু নিখিলেশের পাঠ পাঠপরিক্রমা ক্রমে সর্বনাশ রূপ সন্দীপের হাতে এসে শেষ হয়েছে। নিখিলেশ এবং সন্দীপের মানসভূমির মধ্যচক্রে বিরাজ করছে রবীন্দ্রসৃষ্ট এই চমৎকার নারীচরিত্র আর অন্তঃচক্রের দ্বিমেরুতে অবস্থান করছে দুই ব্যর্থ প্রেমিক নিখিলেশ ও সন্দীপ। তাই বলা যায়, বিমলার গভীর মনস্তত্ত্বই প্রকৃত অর্থে বাকি দুটি চরিত্রের মানস পটভূমিকে বিশ্লেষণের যোগ্য করে তুলেছে।

বিমলা চরিত্রের মানসিক পরিবর্তনের শুরু সন্দীপের আগমনের পর থেকে। চতুর সন্দীপের কথার জালে বিহ্বলা বিমলার মনে মানসিক বিভ্রান্তি ঘটেছে। বিমলার অবচেতন মনের মধ্যে কোথাও যেন তার রূপ সম্বন্ধে একটা হীনমন্যতা (Inferiority Complex) ছিল। তাই সন্দীপের সাথে দেখা হবার পর তার মনে হয়ঃ

> *"আমি সত্য কথা বলব। সেদিন আমার মনে হয়েছিল বিধাতা কেন আমাকে আশর্য সুন্দর করে গড়লেন না? কারো মন হরণ করার জন্য যে, তা নয়। কিন্তু রূপ যে একটা গৌরব।"*

প্রশ্ন জাগে, সন্দীপের স্তুতি কি তার সেই হীনমন্যতাকে দূর করেছিল ও নারীর সেই স্বাভাবিক প্রবণতা যা পুরুষের মুখে নিজের রূপের স্তুতি শুনে জেগে ওঠে তাকেই কি প্রজ্জ্বলিত কর তুলেছিল? এটাই কি বিমলার পদস্খলনের অন্যতম প্রধান কারণ? হয়তো তাই, নাহলে সন্দীপ যখন তাকে 'মক্ষী' বলে সম্বোধন করেছে আর সেই খেতাবের জয়তিলক নিজের মানসললাটে ধারণ করে বিমলার সগর্ব উক্তিঃ

> *"আমার বুক ফুলে উঠল, আমার কূল ছাপিয়ে গেল, সমুদ্রের ডমরুর তালে তালে আমার স্রোতের কলতান আপনি বেজে বেজে উঠতে লাগল।"*

এইক্ষণে সন্দীপের চাটু বাক্যে বিমলার মনে হয়েছে যেন তার নবজন্ম ঘটেছে, তারও বিশ্বাস জন্মেছে যে সে যেন সত্যই অপরূপ সুন্দরী ও অসাধারণ বুদ্ধিমতী। এ সময় বিমলার মনের অনুভব:

> *"ক্রমেই আমার বিশ্বাস পাকা হতে লাগল যে, সেদিন সমস্ত দেশে যা কিছু কাজ চলছিল, তার মূলে ছিলেন সন্দীপবাবু, আর তারও মূলে ছিল একজন স্ত্রীলোকের সহজবুদ্ধি। প্রকান্ড একটা দায়িত্বের গৌরবে আমার মন ভরে রইল।"*

স্বদেশী আমলে দেশসেবার দায় ও দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন অনেক নারীই। বিমলা তাদেরই একজন হয়ে উঠতে চেয়েছিল। স্বামী নিখিলেশ নারীব্যক্তিত্ব প্রকাশের যে স্বাধীনতা তাকে দিয়েছিল, সন্দীপের কথায়, দেশসেবার মন্ত্র উদযাপনে তারই একটা প্রকৃত মুক্তির পথ বিমলা খুঁজে পেয়েছিল। কিন্তু ক্রমে তার প্রতি সন্দীপের স্তুতি ও নিরন্তর বন্দনায় তার দেশসেবার আদর্শের চেয়ে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিলাভের আকাঙ্ক্ষাই বড় হয়ে উঠেছে। নিজেকে তার 'শক্তিতত্ত্ব' ও 'রসতত্ত্ব'-এর উৎস বলে মনে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ স্বভাবজ ভঙ্গিমায় এখানে বিমলাকে শ্রীরাধিকার সাথে তুলনা করে বলেছেন, যেমন গোপিকারঞ্জন রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির আওয়াজ শুনে অভিসারিকা রূপে রাত্রির অন্ধকারে গৃহত্যাগ করতো এসময়কার বিমলার অবস্থা তেমনই। সে যেন এক ছন্নছাড়া, বাঁধনহারা নারীর রূপ।

বিমলার মনে সন্দীপের হিপনোটিজমের প্রতিক্রিয়া ক্রমশঃ এক অদ্ভুত অস্থিরতা, এক অপপার্থিব নেশা তৈরী করেছে। নিখিলেশ যখন বিমলার এ অধঃগতিক্ষণে রাত্রির অন্ধকারে একাকী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছে তখন বিমলার সচেতন মন তার অবচেতন মনের অবিরাম বিষাক্ত ছোবলে অসহায় আর্তনাদ করে উঠেছে। এ পর্বে বিমলার অনুভব:

> *"... আমি কি মরে যাব, সন্দীপ কি চলে যাবে... না ঘাড়মোড় ভেঙে এমন সর্বনাশের তলায় তলিয়ে যাব যেখান থেকে ইহজীবনে আমার আর উদ্ধার নেই?...জীবনের সৌভাগ্যকে সরলভাবে গ্রহণ করতে পারলুম না, এমন করে ছারখার করে দিলুম কি করে?"*

এ পর্বেই সন্দীপের মোহে মোহান্ধ বিমলার দশা জালবদ্ধ রোহিতের মতো মনে হয়। তার অবচেতন মনের নারীত্ব, সুপ্ত যৌনতা সন্দীপের আকর্ষণী বাক্যের স্রোতে মরণচাকির মতো পাক খেয়ে চলেছে। ঘূর্ণির মতো তার বেগ, তীরের মতো তা অন্তর্ভেদী। এ পর্বে দেখি অবচেতনে সন্দীপের কাছে বন্দী বিমলার মন ছটপট করে মুক্তির পথ খুঁজেছে। পালাবার কোনো পথ নেই। অসহায় এ ছটপটানি, তবু দুর্বার এ আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য। সন্দীপের কথায় তার মনের আগল ভেঙেছে, ঘরের দেওয়াল ভেঙে সে একেবারে অজানা, অনিশ্চিত এক তুফানের মুখে পড়ে তীর বেগে ছুটে চলেছে। এই কি 'দেশের আদেশ'?, তার মধ্যে সন্দীপের দেখা 'দেশের শক্তি'? শক্তির এ কোন্ 'জয়টীকা' সন্দীপ তাকে পরাতে চায় সে জানে না। ভাষার জাদুতে, সম্মোহনের শক্তিতে যে দেশকে প্রণয়ের প্রলয়শিখা করে তোলে, প্রণয়কে মুহূর্তে করে তোলে সর্বগ্রাসী বহ্নি তার দৃষ্টিবানের সামনে, বৃশ্চিক-ইচ্ছার আলিঙ্গনে বিমলা স্থবির, স্থাণূ ও কর্মশক্তিহীন হয়ে পড়েছে।

সম্মোহন যে কত তীব্র হতে পারে এ উপন্যাসের ভাষায় তার খানিকটা আন্দাজ পাওয়া যায়। সন্দীপের সম্মোহনের আবেশে বিমলার চোখ বুঁজে যায়। কিছু পরে চোখ মেলে সে বলে ওঠেঃ

> *"ওগো প্রলয়ের পথিক, তুমি পথে বেরিয়েছ, তোমার পথে বাধা দেয় এমন সাধ্য কারও নেই।....রাজা আমার, দেবতা আমার, তুমি আমার মধ্য কী দেখে'ছ তা জানিনে, কিন্তু আমি আমার এই হৃদপদ্মের উপরে তোমার বিশ্বরূপ যে দেখলুম। তার কাছে আমি কোথায় আছি! সর্বনাশ গো সর্বনাশ, কী তার প্রচণ্ড শক্তি! যতক্ষণ না সে আমাকে সম্পূর্ণ মেরে ফেলবে ততক্ষণ আমি তো আর বাঁচি নে, আমি তো আর পারি নে, আমার যে বুক ফেটে গেল!"*

এরপরই বিমলা চৌকির উপর থেকে মাটিতে পড়ে গিয়ে সন্দীপের দুটি পা জড়িয়ে ফুলে ফুলে কেঁদেছে। বিমলার চেতন-অবচেতনের এ অস্থির দোলাচলকে রবীন্দ্রনাথ অনন্য বর্ণনায় তুলে ধরেছেন। বলাইবহুল্য সন্দীপের স্বার্থসিদ্ধি ও বিমলার পতনের সাথে সাথে উপন্যাসের প্লটও তার শীর্ষবিন্দুতে পৌঁচেছে।

কিন্তু প্রশ্ন জাগে, পাপ ও পতনের এ দুঃসহ মুহূর্তে কি বিমলার মনে একবারও তার আত্মবোধ জেগে ওঠে নি? নিখিলেশের প্রতি তার অন্যায়ের জন্য অনুশোচনা কিম্বা আপন কৃতকর্মের জন্য তার পাপবোধ কি বিমলার মনে কোনো অন্তর্দংশন ঘটায় নি? ফ্রয়েডীয় সূত্রানুযায়ী সম্মোহনে আক্রান্ত ব্যক্তির চেতন মন সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত তার মনে এই সম্মোহনের জাদুকরী প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে ভাবলোকেরই অধিবাসী হয়, চেতন মনে তার কোনো বিক্ষেপণ অনুভূত হয় না। এ পর্যায়ে অলীক অবলোকন (Hallucination), মানসিক বিভ্রান্তি ও উন্মাদগ্রস্ততাও অস্বাভাবিক নয়। বিমলার ক্ষেত্রে মানসিক বিভ্রান্তি ও চূড়ান্ত অস্থিরতার যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে। এ পর্যায়ে তার কাছ থেকে স্বাভাবিক বোধ ও বিচক্ষণতা আশা করা অবান্তর। তবে সন্দীপের দ্বারা সৃষ্ট সম্মোহনের প্রথম পর্যায়ে বিমলার এ অস্থিরতা ছিল না, তখনও তার মধ্যে শুভ ও অশুভ ভেদের বিচার স্পষ্ট ছিল। এ প্রসঙ্গে একটি ছোট্ট উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বিমলার প্রায় নিষ্ক্রিয় বিবেকের সামনে যখন নিখিলেশের আদর্শের প্রতীক বৃদ্ধ মাষ্টারমশাই চন্দ্রনাথবাবু এসে দাঁড়ালেন এবং স্বামী নিখিলেশ তাঁর সাথে বিমলার পরিচয় করিয়ে দিলেন, তখনঃ

> *"আমি তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। তিনি আশীর্বাদ করলেন,*
> *মা, ভগবান তোমাকে রক্ষা করুন।*
> *ঠিক সেই সময়ে আমার এই আশীর্বাদের প্রয়োজন ছিল।"*

লক্ষণীয়, মাষ্টারমশাই চন্দ্রনাথবাবু কি ভেবে এ কথা বিমলাকে বলেছিলেন তার চেয়েও বড় কথা হলো, বিমলার তাৎক্ষণিক ভাবনার মধ্যে স্পষ্টতঃই এক অপরাধভারের পীড়া (Guilt Complex) লুকিয়ে আছে। হয়তো অবচেতন মনে এ সময় যে কোন প্রকারে সন্দীপের অশুভ রাহুগ্রাস থেকে মুক্তি কামনায় সে এক শুভ শক্তির প্রত্যাশী ছিল। এখানেই হয়তো একবার হলেও বিমলার বিবেকের অন্তর্দ্বন্দ্বের সন্ধান মেলে। কাছারিতে ডাকাতির পর যখন নিখিলেশের বিনিদ্র রাত কেটেছে তখনও একবার নিখিলেশ দেখেছে ফাঁকায় পড়ে বিমলা কেঁদে চলেছে। নিখিলেশ যখন তার কাছে এগিয়ে এসে তার মাথায় হাত রেখেছে তখন বিহ্বল, আত্মবিস্মৃত বিমলা নিখিলেশের পা দুটি নিজের বুকে চেপে ধরে অঝোর ধারায় অশ্রুবর্ষণ করেছে। মনে রাখতে হবে, সন্দীপের সম্মোহনী প্রভাবের বশবর্তী হয়ে একদিন বিমলা সন্দীপের পায়েও লুটিয়ে পড়েছিল। আর আজ যখন সে নিখিলেশের দুটি পা নিজের বুকে টেনে নিলো তখনই পাঠকের বুঝতে বাকি থাকে না যে বিমলার মোহমুক্তির দিন সমাগত প্রায়। এ দুটি-একটি দৃশ্য ছাড়া উপন্যাসের বাকি অংশে অধিকাংশ সময় মোহগ্রস্থ বিমলা নির্বিকার ভাবে নিজের অবদমিত ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ও যৌনচেতনার কাছেই সমূলে আত্মসমর্পণ করেছে।

ফলতঃ বিমলার পঞ্চম আত্মকথাটি উপন্যাসে প্লটের বিচারে যেমন এক চরম বিবর্তন এনেছে তেমনি বিমলার মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তনের ক্ষেত্রেও এ অংশটির ভূমিকা অপরিসীম। এখানেই আমরা দেখি মোহান্ধ গৃহবধূ বিমলা চরম মানসিক বৈকল্যের শিকার। কখনো বাগানের শষ্পশয্যায় শুয়ে আবার কখনো বা শ্লথপদে মায়াজাল শিকারী সন্দীপের দিকে এক পা এক পা করে সে এগিয়ে চলেছে। মূর্তিমান শয়তানের আদেশ তামিল করতে বাড়ির সিন্দুক থেকে নিজের অলংকার ও পরিবারের গচ্ছিত সম্পদ চুরি করে সে একদিকে যেমন কামিনী-কাঞ্চন লোভী সন্দীপের সর্বগ্রাসী স্পৃহাকে পরিতৃপ্ত করতে চেয়েছে তেমনই এক লহমায় নিজের বংশগৌরবও ধ্বংস করেছে। সেইসঙ্গে অবিরত অবচেতনার দংশনও অনুভব করে চলেছে। এ পর্যায়ে বিমলার মনে চেতন ও অবচেতনের এক অস্থির টানাপোড়েন লক্ষ্য করা যায়। বিমলাকে তার অবচেতনার দংশন ও যন্ত্রণা থেকে একজনই মুক্তি দিয়েছে, সে অমূল্য। অমূল্যর সাহস আর প্রতিবাদই বিমলার মোহমুক্তির প্রকৃত কারণ। সন্দীপের কপটতা আর মিথ্যা পৌরুষত্বের অহংকার ভেঙেছে অমূল্য। এতদিনে সত্যিকারের দেশাত্মবোধের জাগ্রত বিবেক আর বীরত্ব বিমলা দেখেছে অমূল্যের মধ্যে। অমূল্যর ভূমিকার কথা উপন্যাসে কি সেকথা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু সে ভূমিকার বাইরেও অমূল্যর আরো একটি ভূমিকা আছে। সে বিমলার মনে শুভচেতনার উদ্বোধক। সে না আসলে বিমলা প্রকৃত অর্থে জেগে উঠতে পারতো না, ফিরে আসতে পারতো না তার জীবনের মূল স্রোতে। আপাতদৃষ্টিতে অমূল্যর পরিচয় এ উপন্যাসে সমকালের এক প্রশংসনীয় সন্ত্রাসবাদী অথবা প্রকৃত দেশপ্রেমিক হলেও বিমলার ঝোড়ো সময়, অস্থির ও দোদূল্যমান জীবনে সে এসেছে অনাগত সন্তানের স্বপ্নঅধ্যাসের অমরাবতী থেকে। সন্তানহীনা বিমলার অবচেতন মনে যে সন্তানস্পৃহা ছিল তা পূরণ করেছে এই অপাপবিদ্ধ কিশোর। অনুশোচনার আবেগে যখন বিমলা মূহ্যমান তখনই এসেছে অমূল্য, উপন্যাসের মধ্যে লেখক যার সম্পর্কে বলেনঃ "কচি মুরলী বাঁশিটির মতো সরল ও সরস।" আর অমূল্যর সাথে দেখা হওয়ার পর বিমলার মনের অনুভবঃ

> *"আমার ভিতরে মা জেগে উঠলো। ....অমূল্য তার তরুণ মুখের দীপ্তি আমার জীবনের মধ্যে নূতন উষার প্রথম অরুণরেখাটির মতো মতো এঁকে দিয়ে গেল।"*

এরপরই বিমলার মন্ত্রমুগ্ধ অবচেতনের জাল ছিন্ন করে সচেতন বাস্তব উপলব্ধিতে ফিরে আসার পালা। বিমলা সোনার গিনিগুলো হাতে হাজির হয়েছে সন্দীপের কাছে। মোড়ক খুলে গিনিগুলো দেখতেই সন্দীপের চোখে দেখা দিয়েছে দিগ্বিজয়ের ঝিলিক্। এরপরই সন্দীপ চৌকি থেকে লাফিয়ে ছুটে এসেছে বিমলার কাছে। কি মতলব ছিল তার কে জানে, কিন্তু বিমলা তৎক্ষণাৎ অমূল্যের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছে সে মুখ চাবুকাহত মানুষের ন্যায় আতংকে বিবর্ণ। তারপরই সম্বিত ফিরে পাওয়া বিমলা তার দিকে ধাবমান সন্দীপকে নিজের সর্বশক্তি দিয়ে ঠেলা মেরেছে। পাথরের টেবিলের উপর মাথাটা গড়িয়ে পড়ার পর কিছুক্ষণ সন্দীপের দিক থেকে কোনো সাড়া আসে নি। ওদিকে দীপ্ত মুখে অমূল্য সন্দীপের দিকে ফিরেও না তাকিয়ে বিমলার পায়ের ধূলো নিয়ে তার পায়ের কাছে এসে বসেছে। কিন্তু তখনও ঘটনার কিছু বাকি ছিল। এরপর অমূল্যকে বিমলা গয়নার বাক্সটা দিয়ে ছয় হাজার টাকা আনতে বলেছে। উদ্দেশ্য গয়না বিক্রির টাকা দিয়ে সে চুরি করা মোহরের ক্ষতিপূরণ দেবে। এই সূত্রেই অমূল্যর গয়না বিক্রি না করে কাছারী বাড়ীর একটু দূরের এক অফিস বাড়ীর ক্যাশ লুঠ করার প্রসঙ্গ ওঠে। ইতিমধ্যেই বিমলা দেখে প্রথমবারের ব্যর্থকাম সন্দীপ উঠে বসেছে। আর তখন তারঃ "চোখ যেন মধ্যাহ্ন আকাশের তৃষ্ণার মতো জ্বলে উঠতে লাগল।" যেই সে ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের মতো লাফ দিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য বিমলাকে ধরতে এগিয়েছে, সেই মুহূর্তে ক্ষিপ্রগতিতে সরে গেছে বিমলা আর ঘরে ঢুকেছে নিখিলেশ। ঘৃণা-লজ্জা-ভয় যে সন্দীপের মনে কোনো কালে ছিল না সে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝেই পত্রপাঠ কাব্যচর্চায় মন দিয়েছে। আর পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝেই সন্দীপের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে নিখিলেশ সন্দীপকে পাঁচদিনের মধ্যে কলকাতায় যাবার আদেশ দিয়েছে।

উপরিদ্ধৃত গোটা ঘটনাটি পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়, এখানে বিমলার ওপর তার জাদুকরী সম্মোহনের সর্বনাশা প্রভাব কেটে গিয়েছে দেখেই যেমন সন্দীপ তার পরবর্তী লক্ষ্য লুঠ করা মোহরগুলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে

চেয়েছে তেমনি এ ঘটনার মধ্যে দিয়ে বিমলার মনেও চৈতন্যবোধের উদয় ঘটেছে। সে এক লহমায় সন্দীপের স্বরূপ বুঝতে পেরে নিজেকে চরম পতনের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। আর এ সব কিছুর মধ্যে দিয়েই অমূল্য তার 'দিদিরাণী'কে (বিমলা) নতুন করে খুঁজে পেয়েছে, বিমলা অমূল্যর মধ্যে খুঁজে পেয়েছে তার সুপ্ত মাতৃচৈতন্য আর পুত্র স্নেহধারা। অন্ততঃ বিমলা ও অমূল্যর পরবর্তী কথোপকথন তারই সাক্ষ্য দেয়। তাই অমূল্য সম্পর্কে এ পর্বে বিমলার অনুভূতি লেখকের ভাষায়:

> *"নির্মল তুমি, সুন্দর তুমি, বীর তুমি, নির্ভীক তুমি, তোমাকে প্রণাম। জন্মান্তরে তুমি আমার ছেলে হয়ে আমার কোলে এসো, এই বর আমি কামনা করি।"*

এ পর্যায় থেকেই বিমলাকে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও প্রকৃতিস্থ বলে মনে হয়। বিমলার আত্মশুদ্ধির পালা রচিত হয়েছে এরপর থেকেই। যে বিমলা আন্তরিক প্রীতি নিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে পারেঃ 'সব ধুয়ে মুছে একবার গোড়া থেকে পরীক্ষা করো প্রভু' সে বিমলা এক নতুন বিমলা। কিন্তু এই নতুন বিমলার পরিণতি সুন্দর নয়। কারণ প্রথম পরিচ্ছেদেই বিমলার আত্মকথাতে পাই:

> *"যেটা নিঃশ্বাসের মতো সহজ ছিল, সেটাকে কাব্যকলার মতো গড়ে তোলার উপদেশ আসছে। এখানের ভাবুক পুরুষেরা সধবার পাতিব্রত্যে এবং বিষধর ব্রহ্মচর্যে যে কি অপূর্ব কবিত্ব আছে, সে কথা প্রতিদিন সুর চড়িয়ে চড়িয়ে বলছেন।"*

উপরোক্ত বাক্যবন্ধে ক্রিয়াপদের ব্যবহার দেখলেই বোঝা যায়, উপন্যাসের কাহিনীটি নিখিলেশের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রচিত। তখন বিমলার জীবনে বৈধব্যের অনন্ত অন্ধকার নেমে এসেছে। তবে বিমলার মনস্তত্ত্ব বিচারে রবীন্দ্র সমালোচক প্রভাতকুমারের একটি কথা বোধ হয় প্রকৃত অর্থেই খুব খাঁটি। প্রভাতকুমারের ভাষায়:

> *"অপযশের পশরা মাথায় করিয়া অবশেষে তাহাকে নিরাভরণ বিধবারূপে নিষ্ঠুর জগতে একাকী দাঁড়াইতে হইল। নিঃসন্তান জীবনের একমাত্র সম্বল থাকিল আদর্শনিষ্ঠ স্বামীর স্মৃতি।"*

পাপের কলংকমুক্ত বিমলার জীবনে চিত্তশুদ্ধি ঘটলেও রবীন্দ্রনাথ এ উপন্যাসের শেষে যেন চরম শাস্তির দন্ডেই তাকে দন্ডিত করেছেন। প্রকৃত অর্থে বিমলার জীবনে নিখিলেশের থাকা আর না থাকার মধ্যে যেমন কোনো অন্তরায় নেই, নেই পার্থক্যও। সমাজের চোখে অপযশের বোঝা মাথায় নিয়ে শেষপর্যন্ত বিমলা সেই পাপিয়সী নারী হয়েই রয়ে গেছে। নিখিলেশ থাকতেও তার জীবনে প্রেমহীনতা ছিল, নিখিলেশ পরবর্তী জীবনেও সে প্রেমহীনতা তার রয়ে গেছে। বাড়তি বোঝার মতো সেখানে চেপেছে নিঃসন্তান, অন্ধকারময় অনন্ত বৈধব্য জীবন আর 'আদর্শনিষ্ঠ স্বামীর স্মৃতি'। এই তো বিমলার সত্যিকারের আবহমান অবচেতন! সমালোচকের বলা 'আদর্শনিষ্ঠ স্বামীর স্মৃতি' কথাটিকে ব্যঙ্গের মতো শোনালেও বিমলার মনস্তত্ত্ব বিচারে তা অত্যন্ত বাস্তব বলেই মনে হয়। শুধুমাত্র 'আদর্শনিষ্ঠ স্বামীর স্মৃতি' বা তার আদর্শই যে নারীমনের গহীন গভীরে লুকিয়ে থাকা সকল চাওয়া-পাওয়ার পূর্তি ঘটাতে পারে না 'বিমলা চরিত্র' তার জীবনের মধ্যে দিয়ে উপন্যাসে সে কথা প্রমাণ করে গেছে।

তথ্যসুত্র:

১। ঘরে বাইরে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯৪
২। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস: নবমূল্যায়ন, অমরেশ দাস, পুস্তক বিপণি, এপ্রিল ২০০২
৩। রবীন্দ্র উপন্যাসে নারীর অধিকার চেতনা, ড. শাহিদা রহমান, দে'জ পাবলিশিং
৪। রবীন্দ্রনাথ, অনিলচন্দ্র ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং

৫। রবীন্দ্র উপন্যাস পরিক্রমা, অর্চনা মজুমদার, দে'জ পাবলিশিং
৬। রবীন্দ্র উপন্যাস: ইতিহাসের প্রেক্ষিতে, ভূদেব চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং
৭। রবীন্দ্রনাথ: নারী মনস্তত্ত্ব, ড. ফেরদৌসী হক্, মূর্ধন্য পাবলিকেশন
৮। মনঃসমীক্ষণের রূপরেখা, সিগমুন্ড ফ্রয়েড, অনুবাদ-সাজিদ হাসান, ঐশী পাবলিকেশনস্